AMITRAKSHAR
PUBLISHERS

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা

সম্পাদনা : স্বরূপ দে, মিঠু জানা, সোনালী ভূমিজ

সহ-সম্পাদনা : নারায়ণ কুইলা, রুচিরা গুহ, সোনালী গোস্বামী, নিবেদিতা ঘোষাল

First Published on
30th November, 2024
by
Amitrakshar™
Publishers
Kolkata – 700068
© Copyright reserved by Dept. of Bengali, Hijli College
ISBN: 978-93-6008-989-4
(Hardback)
Price: 400.00
Title of the Book:
স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা
(Swadhinata Uttar Bangla Upanyse Adhunikata)
Edited by:
Dr. Swarup Dey | Dr. Mithu Jana | Sonali Bhumij
Co-Edited by:
Dr. Narayan Kuila | Dr. Ruchira Guha |
Dr. Sonali Goswami | Nibedita Ghoshal
Language: Multiple languages
Publisher and Type setter: Amitrakshar Publishers
Typeset in Avro Bangla Keyboard
Page No.: 238
Printed by: Amitrakshar Publishers & M. Enterprises
Website: www.amitrakshar.co.in
Website link: https://www.amitrakshar.co.in/book/
Email id: amitraksharpublishers@gmail.com
Phone/ WhatsApp Number: 9735768900
Published by:

AMITRAKSHAR
PUBLISHERS
AN ISO 9001:2015/QMS/092020/19534

Office: 1/199, Jodhpur Park, Gariahat Road, Kolkata- 700068

All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including, photocopying and recording, or in any information shortage or retrieval system, without permission in writing form the publisher.

ISBN : 978-93-6008-989-4

‘নুনবাড়ি’ : লিঙ্গ রাজনীতির প্রভাব ক্ষুণ্ণ করে নারী জাগরণের আখ্যান

ড. রাকেশ জানা[1]

সত্তর দশকে বাংলা উপন্যাস ও গল্পে যে ব্যাপক বাঁকবদলের সূচনা হয়, অনিল ঘড়াই ছিলেন সেই ধারারই অন্যতম এক লেখক। এই সময় একদল তরুণ লেখক যথা- ভগীরথ মিশ্র, নলিনী বেরা, অভিজিৎ সেন, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় উঠে আসছে নিম্নবর্গীয় মানুষদের লড়াইয়ের ছবি। এদের সাথেই একের পর এক লেখায় গভীর দরদে অনিল ঘড়াই এঁকে চলেছেন প্রান্তিক মানুষ ও জনজীবনের ছবি। অনিল ঘড়াই-এর জন্ম ১ নভেম্বর, ১৯৫৭, মেদিনীপুর জেলার রুক্মিনীপুর গ্রামে। শৈশব-কৈশোর এবং যৌবনের অনেকটা সময় তিনি অতিবাহিত হয়েছে নদিয়ার কালীগঞ্জে। তিনি পেশায় দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের সেকশন ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর কর্মস্থল ছিল বিহারের চক্রধরপুর মাইক্রোওয়েভ স্টেশন। ‘পরীক্ষিৎ’ এবং ‘শব্দযুগ’ এই দুটি স্বসম্পাদিত ছোট পত্রিকার মাধ্যমেই বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ। ‘কাক’ তাঁর প্রথম গল্প সংকলন, ‘নুনবাড়ি’ প্রথম উপন্যাস। ১৯৯১ সালে ‘নুনবাড়ি’ উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন সোপান সাহিত্য পুরস্কার। তাঁর সাহিত্য রচনার জন্য ঐ বছরই পেয়েছেন দিল্লির সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সর্বভারতীয় ‘সংস্কৃতি’ পুরস্কার। ‘বক্ররেখা’ উপন্যাসের জন্য মাইকেল মধুসূদন পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৯৪ সালে। এছাড়াও নানান পুরস্কার এবং সম্মানে ভূষিত। প্রখর বাস্তববাদী, মানবদরদী এই লেখক ভালবাসতেন শব্দের ছবিতে মানুষকে চিত্রায়িত করতে। সমকালীন সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র বলেছিলেন– গ্রামজীবনকে নিয়ে এত নিবিষ্টভাবে এত অনুপুঙ্খ সহকারে আমাদের মধ্যে আর কেউই বুঝি লেখেননি। গ্রামজীবনে এমন অতলান্ত অবগাহন আর কারোর কলমেই আসেনি।

লেখক পরবর্তীকালে কর্মসূত্রে নদীয়া জেলার বাসিন্দা হয়ে পড়লেও তাঁর সাহিত্যমননের শিকড় ছিল পূর্ব মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। তাঁর লেখায় ধরা দিয়েছে জেলার প্রান্তিক, অন্ত্যজ, দরিদ্র মানুষদের জীবনসংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, স্বপ্নবিলাস ও স্বপ্নভঙ্গের নানান ছবি। পূর্ব মেদিনীপুরের লোকজীবনের সংস্কৃতি, লোকাচার, আঞ্চলিক ভাষা-সবই তাঁর গল্প-উপন্যাসের শরীর-নির্মাণে অঙ্গীভূত হয়েছে। অনিল ঘড়াই-এর প্রথম উপন্যাস ‘নুনবাড়ি’-তে পূর্ব মেদিনীপুরের নোনাখাল, গঞ্জের হাট-সংলগ্ন এলাকার নুনমারা সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকার যুদ্ধ ফুটে উঠেছে। তাঁর ‘নীল দুঃখের ছবি’ (২০০১) উপন্যাসের পটভূমিতে উঠে এসেছে এগরা-২ থানার বালিঘাই ও

[1] **সহকারী অধ্যাপক**, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ, ভাদুতলা, পশ্চিম মেদিনীপুর।

 ISBN : 978-93-

মাঠপুকুর গ্রামের জীবনকথা। অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে কেলেঘাই নদী, তাজপুর বাঁধ, ভবানীচক প্রভৃতি অঞ্চলের কথা-ও। 'সামনে সাগর' (২০০৩) উপন্যাসটি সম্বন্ধে লেখক নিজেই বলেছেন-"দীঘাকে নিয়ে উপন্যাস লেখার ইচ্ছে আমার বহুদিনের। সেই ইচ্ছের কিছুটা হলেও পূরণ হয়েছে, এটা ভেবে স্বস্তি পাই। শ্রমজীবি ভূমিহীন সহায় সম্বলহীন কিছু মানুষ দীঘার সমুদ্রকে অবলম্বন করে আজও বেঁচে আছে। তারাই এই উপন্যাসের কুশীলব"[১]।

এইভাবে তিনি উপন্যাসে বাংলা সাহিত্যের ভৌগোলিক পরিধিকে বিস্তৃত করার কাজটি সম্পন্ন করেছেন সচেতনভাবে। তার সঙ্গে মিশে গেছে তাঁর সহজাত মানবিকতার বোধ, সমাজের পিছিয়ে থাকা জনসমষ্টির প্রতি অকৃত্রিম সমবেদনা। এছাড়াও জেলার সাহিত্যজীবীদের একই মঞ্চে নিয়ে এসে সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশের দিকেও তাঁর উৎসাহ ছিল প্রশংসনীয়। সম্পাদনা করেছেন 'মেদিনীপুর জেলার গল্প সঙ্কলন' (২০০২)। 'দক্ষিণের কৃষ্ণচূড়া' (দুই মেদিনীপুরের বিশিষ্ট কবিদের কবিতা-সঙ্কলন) প্রভৃতি গ্রন্থ। পত্রিকা সম্পাদনার জগতে তিনি পা রাখেন ১৯৭৯ সালে, 'কোয়েল' পত্রিকা-প্রকাশনার মাধ্যমে। তারপরেও সম্পাদনা করেছেন 'শব্দযুগ' (১৯৮৪) 'তূর্য' (২০০৯)-এর মত পত্রিকা। অসুস্থ শরীরেও পত্রিকা সম্পাদনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি সক্রিয় থেকেছেন। ২০১৪-র ২৩শে নভেম্বর মাত্র ৫৭ বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণ একালের বাংলা সাহিত্যজগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়।

লেখকের সাক্ষাৎকার অংশে ফুটে ওঠে সাধারণ জীবনের প্রতি গভীর দরদ। সুনীল মাজি অনিল ঘড়াইয়ের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন তাতে আমরা জানতে পারি- "তারা সব আমার কলমে এসে গেছে আত্মীয়ের মতো। ... আমি আমার মস্তিষ্ককে কোন চরিত্রের ভেতর ঢুকিয়ে দিই না, বরং তাদের সমস্যা বুক দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করি। তাদের চোখ দিয়েই তাদের দেখার চেষ্টা করি। ...গ্রামের মানুষের জীবনধারণের জন্য, বেঁচে বর্তে থাকার জন্য অহোরাত্র যে সংগ্রাম চলছে, সামাজিক অবক্ষয়, স্বার্থপরতা, মানুষে মানুষে হানাহানি এ সবই আমার লেখায় তুলে ধরার চেষ্টা করি...যারা সমাজে নিচুতলার মানুষ হয়ে জন্মানোর অপরাধে অভিশপ্ত জীবন ভোগ করেছেন ...দুঃখ দারিদ্র্য আজও যাদের নিত্যসঙ্গী অথচ যারা আজও বিবেকী, সৎ, মানবতার জয়গানে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পিছু হটে না- আমি তাদের গান গাই, ছবি আঁকি, গল্প শোনাই। গ্রাম বাংলার রূপ বৈচিত্র্য, জীবন সংস্কৃতি, সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত মানুষের বেঁচে থাকার হুবহু ডকুমেন্টেশনই আমার উদ্দিষ্ট"[২]

অনিল ঘড়াই-এর প্রথম উপন্যাস 'নুনবাড়ি' (১৯৮৯) ছিল নুনমারা সম্প্রদায়ের একটি অবহেলিত মেয়ের ঘুরে দাঁড়ানোর আখ্যান, যার পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে মলঙ্গী সমাজের জীবন-ছবি। কালাচাঁদের স্ত্রী লবঙ্গ সর্বস্ব হারিয়েও ঘুরে দাঁড়ায়, আঁকড়ে ধরে নুনমাটি বা মাটির নুনবাড়ি, যেখানে পাতন পদ্ধতিতে নুনজল গড়িয়ে, তা আগুনে ফুটিয়ে নুন তৈরি হয়। এ ভাবেই নারী ও নুন একাকার হয়ে যায় এই আখ্যানে। অনিল বলেছেন- "যৌবন হল নুনমাটির মতো। কাদা ভুসভুসে খোলামকুচি মেটানো মাটি। যা দিয়ে প্রতিমা

ISBN : 978-93-6008-989-4

হয়, মূর্তি হয়-শিল্প হয়। কিন্তু তাতে প্রাণ থাকে না। যার প্রাণ থাকে তা পড়ে থাকে না। সে ওই সন্তর্পণে চলে যাওয়া নুনের মতো একলা অভিমানী প্রত্যাখ্যাতা যৌবন জ্বালায় দগ্ধ ক্ষুধার্ত এক নারী; যে মাটি ছেড়ে চলে যায় কোন আকর্ষণে, কোন মাথায় তা সে নিজেও জানে না। এই না-জানা রহস্যের ভেতরে তার বেঁচে থাকা, বেড়ে ওঠা, বৈচিত্র্যময় পদচারনা। ক্ষুধা ও কামনার জপ তপ উপাসনা অথবা আপস, নয় তো আমৃত্যু ক্ষুধা ও কামনার সাথে লড়াই"৩ 'মুকুলের গন্ধ' (১৯৯৩) উপন্যাস লেখা হয়েছে জগেন জমাদারের পরিবারকে কেন্দ্র করে। 'মেঘ জীবনের তৃষ্ণা' (১৯৯৬)-এ অনিল হাঁড়ি সম্প্রদায়কে ধরতে চেয়েছেন, রয়েছে তাদের সংস্কৃতি, লোকাচার, সংস্কার, কুসংস্কার, ঐতিহ্য, জীবন ও জীবিকার ছবি। 'দৌড়বোগাড়ার উপাখ্যান' (১৯৯৭) উপন্যাসে বিহারের আদিবাসী জনজাতির আখ্যানকে অবলম্বন করে গড়ে উথেছে। দৌড়বোগাড়া নদীতে শীতের মরসুমে স্থানীয় আদিবাসী মানুষেরা সোনা খুঁজতে যায়। এটা ওদের জীবিকা। অখ্যাত এই নদী ও তার পার্শ্ববর্তী আদিবাসী জনজীবনই উঠে এসেছে লেখকের এই রচনায়। 'বনভূমি' (১৯৯৮) উপন্যাসে আদিবাসীদের দারিদ্রপীড়িত জীবনের সমান্তরালে রয়ে গেছে ক্রমশ বিবস্ত্র বনভূমি, কাক আর শকুনের চিৎকার, মরা ইঁদুর আর ছাগলের দুর্গন্ধ। এখানে অসুখ হলে গুনিন আসে, গুনিন এলে বকরির পূজা হয়, কু-সংস্কারের বীজগুলো চৈত্রের ফাটা শিমুল তুলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে এক অন্ধ কোণ থেকে আর এক অন্ধ কোণে। তাঁর 'নীল দুঃখের ছবি' (২০০১) কাকমারা সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ে লেখা প্রথম বাংলা উপন্যাস। এরা উদকাঠি নজরকাঠি বেচে সংসার চালায়। শূকর পালন করে। আসল জীবিকা ভিক্ষাবৃত্তি। 'পাতা ওড়ার দিন' (২০০2) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রাস্তা তৈরির শ্রমিক দলের সর্দার ভানুয়া। 'সামনে সাগর' (২০০৩) উপন্যাসের কুশীলব শ্রমহীন ভূমিহীন সহায়-সম্বলহীন কিছু মানুষ, দিঘার সমুদ্রকে অবলম্বন করে যারা আজও বেঁচে আছে। উপন্যাসের নায়ক সুদামের চোখে সমুদ্র এক বিস্ময়। সুদাম দেখেছে সমুদ্র ঘিরে নানা পেশার মানুষের জীবনযাপন, বাঁশির সুরে বাজিয়েছে পল্লিগীতি, ভাটিয়ালি। অনিল ঘড়াইয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ তথা বাংলা উপন্যাসের একটি স্মরণীয় কীর্তি 'অনন্ত দ্রাঘিমা' (২০০৯)। এই বৃহৎ উপন্যাসে এক প্রান্তিক জনজীবনের ছবি বিস্তৃত পরিসরে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে এই আখ্যানে। অনিল ঘড়াইয়ের একটি চরিত্র হীরালাল বুড়ো, সে চিনতে শেখায় নানা রকম মাটি; আর বলে, 'মাটিকে দুঃখ দিবিনে, মাটি হলো আমাদের মা। মা কাঁদলে সন্তান কাঁদবে।' অনিল ঘড়াইয়ের সমস্ত লেখাই আসলে মাটিকে চেনা এবং তাকে ভালোবাসতে শেখারই কাহিনি।

'নুনবাড়ি' উপন্যাসের নিম্নবর্গীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা পূর্বে অনেকেই করেছেন। কিন্তু উপন্যাসটিকে আধুনিক নারীবাদী ভাবধারা থেকেও বিচার করা যেতে পারে। প্রথাগত শিক্ষা বঞ্চিত সহায়সম্বলহীন এক নারীর স্বনির্ভরতাকে মেনে নিতে অস্বস্তি হয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজের। এই সমাজের নীতি নির্ধারকরা নানা অজুহাতে নারীকে বেঁধে ফেলে গৃহবন্দি করতে চায়। তাই উপন্যাসে ঘৃণ্য লিঙ্গ রাজনীতির চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে লবঙ্গ। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ন্যূনতম রাষ্ট্রক্ষমতার দাবী নিয়ে সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে উদারনীতিবাদীরা যথা- জন লক, অ্যাডাম স্মিথ, জেরেমি বেন্থাম,

ISBN : 978-93-6008-989-4

জেমস মিল ও জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সোচ্চার হয়েছিলেন। সাম্যবাদী ধারণা প্রথম তাঁরাই আনয়ন করেন। এই উদারপন্থীরা মানুষের যুক্তিবাদী মনন ও চিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে চিন্তা, বুদ্ধি, ও মেধার দিক থেকে কোন তারতম্য নেই। এই কারণেই সমাজে বসবাসকারী নারী ও পুরুষদের একই অধিকার ভোগ করা উচিৎ। পুরুষদের মতন তাদেরও শিক্ষার অধিকার, ভোটাধিকার ও সর্বোপরি আইনের সমান অধিকার থাকা উচিৎ। স্টুয়ার্ট মিলের 'The subjection of Woman' গ্রন্থে বিবাহ ব্যবস্থা কীভাবে নারীদের অবদমন করে রাখে তার কথা বলে। যদিও পূর্বে সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকার ছিল। কিন্তু যবে থেকে সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় তবে থেকেই নারীরা পুরুষদের কাছে অধীন। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ফেডরিক এঙ্গেলস তাঁর 'The Origin of the Family, Private Property and State' (১৮৮৪) গ্রন্থে বলেছেন-ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের জন্যই নারীজাতি পদানত। মাতৃসত্ত্ব যেদিন পরাভূত হয় সেদিন পৃথিবীর ইতিহাসে নারীর পরাজয় ঘটে। গৃহের কর্তৃত্বও পুরুষের হাতে চলে যায়, নারীর মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হয় এবং নারীর দাসত্বের সূচনা ঘটে।

সাম্যবাদী ভাবধারা থেকেই নারীবাদের জন্ম। ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে সমাজে এই ধারার পুষ্টিলাভ ঘটে। আসলে 'নারীবাদ' হলো নারীর সমানাধিকার অর্জনের জন্য লিঙ্গবৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলার দাবী; যেখানে নারীরা তাদের সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবে। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে মেরি ওলস্টোনক্রাফট 'A Vindication of the rights of women' গ্রন্থে বলেছেন প্রকৃতিগতভাবে নারী ও পুরুষ সমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও নারীদের পুরুষ অপেক্ষা নিম্নতর বলে মনে করা হয় কারণ তাদের শিক্ষার অধিকার নেই। তাই জাতির অগ্রগতির জন্য নারী শিক্ষা প্রয়োজন। শিক্ষিত নারী একজন পুরুষের প্রকৃত সহকর্মী হতে পারেন। পিতৃতান্ত্রিক ধারণা সমাজে এক ক্ষমতা কাঠামো তৈরি করে এই কাঠামো নারীর অবদমনের মূল কারণ। সিমোন দ্য বোভেয়ারের মতে, পিতৃতান্ত্রিকতার জন্যই সমাজে পুরুষালি গুণাবলী বৈশিষ্ট্য প্রধান বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয় এবং নারী পুরুষত্বের অপর বা other হিসেবে বিবেচিত হয়। সেই কারণেই যুগ যুগ ধরে নারী পুরুষের শোষণ, পীড়ন, অবদমন ও প্রান্তিকরণের শিকার। কেট মিলেট তাঁর 'Sexual Politics' গ্রন্থে পিতৃতান্ত্রিকতার ধারণার সমালোচনা করেছেন। তিনি জাঁ জেনেটের সমকামী যৌনতাকেও স্বাভাবিক আচরণ বলে দাবী করেন। জার মেইন গিয়র 'The Female Eunuch' গ্রন্থে বলেন- ছোটবেলা থেকেই নারীকে তার শরীর সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা শেখানো হয়; এর ফলে নারী তার শরীরকে তথা নিজেকে ঘৃণা করতে শেখে। তার ফলে সে স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে পুরুষদের শোষণের শিকার হয়। এঁরা মনে করেন যে নারীর নমনীয়তা, প্রজনন ও যৌন ক্ষমতাই তাকে অবদমিত করে রাখে। তাই সমাজ নিয়ন্ত্রিত যৌনতার ধারণায় নারীরা 'ভালো মেয়ে' বা 'মন্দ মেয়ে' হিসেবে পরিচিতি পায়। সামাজিক লিঙ্গ রাজনীতির ক্ষমতার বিন্যাসে অচলাধ্যাস ধারণাকে তাই তাঁরা চ্যালেঞ্জ জানান। উগ্র নারীবাদীরা আবার কৃত্রিম প্রজননের বিরুদ্ধাচরণ করেন। কারণ, প্রযুক্তির সাহায্যে কৃত্রিম প্রজনন প্রক্রিয়া নারীর বিশিষ্ট ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণের

এক পদ্ধতি। কটি সন্তান হবে, কখন হবে, পুত্র না কন্যা হবে সবই কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পিতৃতন্ত্র স্থির করে।

এই 'নুনবাড়ি' উপন্যাসে অনিল সমাজের নিচু মানসিকতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। পুরুষ নারীর কাছে শুধুমাত্র যৌনতাই আশা করে। শরীরী ক্ষুধা মিটে গেলেই তার গুরুত্ব হারায়। আখ্যানে আমরা দেখতে পাই-"রোজ রাতে শরীরী সম্পর্ক চুকে গেলে গায়ের ঘাম শুকাতে শুকাতে খোঁটা দিত কালাচাঁদ। তার কাল মুখ সহ্য করাই দায় হয় তখন। বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোন ফল হয় না। পাগলা ষাঁড় গাভীর কোন দুঃখ বোঝে না। তার শুধু গুঁতিয়েই সুখ। কালাচাঁদ ষাঁড়ের গোঁ নিয়ে দিন কাটাত। পোস্টকার্ড এনে বেজার মুখে প্রায়ই বলতো, তোর বাবাকে লিখ, সে তোকে এসে নিয়ে যাক। আমার ভাত কাপড় তো মাগনা নয়"[৪]। পণ প্রথায় শোষণের চিত্র সেসময়ে গ্রাম্য সমাজে প্রবল রূপ ধারণ করেছিল। আখ্যানে প্রান্তিক নারী পণপ্রথার শিকার হয়েছে। লবঙ্গের পিতা জটায়ু বিবাহের যৌতুকের শর্তানুসারে একটা বাইক জামাইকে কিনে দিতে পারেনি; তাই লবঙ্গ শ্বশুরগৃহে ব্রাত্য ও অপয়া। তাই বাড়ত অত্যাচার। এই শোষণ তীব্রতর হলেও; মেয়েদেরকে সমাজ পরামর্শ দিত মানিয়ে নেওয়ার। লবঙ্গও ছোট থেকেই মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতায় বড় হয়েছিল; "বাপের কথাগুলো সাহস জোগাত তাকে। পিঠের চামড়া পুরু করে ইঁট পাথরে গেঁথে নিয়েছিল মনটা। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। সম্পর্কের দেওয়াল ধসে যেতেই পাপ ঢুকল মনে, আর সেই তোড়ে ভেসে গেল কাগজের ফুলের মালা, শোলার টোপর, দূর্বাঘাস আর সাত·পাকে বাঁধা সেই গিঁট কাপড়"[৫]। গঞ্জের রূপসি কন্যার প্রতি অনুরক্ত হয়ে কালাচাঁদ তাকে বিয়ে করে। ফলে স্বামীপরিত্যক্ত লবঙ্গের জীবন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাই একদিন সবার অলক্ষ্যে চিকনি শাক তোলার অজুহাতে সন্তান নোনাইকে নিয়ে পিত্রালয়ে পালিয়ে আসে লবঙ্গ।

লবঙ্গের শ্বশুরগৃহ থেকে পালিয়ে আসাটা বাপ জটায়ুর গলার কাঁটার মত বিঁধে থাকে। লেখক জটায়ুর সেকেলে মানসিকতা ব্যক্ত করেছেন এভাবে- "সোমত্ত মেয়ে ঘরে থাকা মানে বিপদের সঙ্গে বাস করা। কালাচাঁদ অশৌচ হাঁড়ির মতো ফেলে দিয়েছে লবঙ্গকে। তাই লবঙ্গ এখন নোনাখালের অশৌচ হাঁড়ি। তাকে নিয়ে মানুষের খবরদারি। সবাই ওকে নিজের দখলে রাখতে চায়"[৬]। স্বামীর গৃহত্যাগ করে এসে কিছুদিন সে গোবর কুড়িয়ে ঘসি দিল। কিন্তু সেই ঘসি কেউ নিতে চায় না, তাই বিক্রি হয় না। সবাই তাকে গতর খাটালি রাখতে চাইলেও পেট-ভাতালি রাখতে চায়। কিন্তু তাতে নিজের পেট চললেও তিনটি পেট চালানো যায় না। তাই কয়েকদিন সে মুড়ি ভেজেছে, চিড়ে কুটেছে তাতেও বিশেষ সুবিধে হয় না অবশেষে পোদ্দারের ধানকুটা কলে ধানঝাড়ার কাজ করেছিল কিন্তু সেখানেও চোর অপবাদ নিয়ে ফিরে আসতে হয়। পোদ্দার তো তাকে সবার সামনে চাল খোঁজার নাম করে প্রায় ল্যাংটা করে ফেলেছিল। "নিরুপায় লবঙ্গ অসহায় দুহাতে লজ্জা ঢেকে বলেছিল, এগুলান খুদ চাল বাবু। আপনার ঘরের গরুতে খায়, হাঁস মুরগি ছাগলে খায়। ফেলে দিলে তুষের সঙ্গে আমি ঝেড়ে নিয়েছি। এতে আমার অপরাধ কোথায়?"[৭]। এভাবে কর্মক্ষেত্রে নির্যাতিত ও ব্রাত্য হতে হতে শেষে নুনবাড়ি করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই নুনবাড়ি করে গ্রামের মেয়েরা নিজেদের শখ আহ্লাদ মেটায়। কিন্তু নুনবাড়ি "সবার ভাগ্যে

ISBN : 978-93-6008-989-4

সয় না"[৮]। বড় কোটালের পর নদীর চরে নুনপলি পড়লে প্রথম শুরু হয় চর দাগানোর পালা। অনেক ভোরে উঠে চর দাগিয়ে যেতে হয় নইলে ভালো নুনমাটি পাওয়া যায় না। আসলে "নুন হল বড় সোহাগী, শ্বেতপরিদের এক পরি, একটু সেবা যত্নের এদিক-ওদিক হলেই অভিমানী মুখ ঘুরিয়ে নেবে, তখন তার সফেদ ফেনাতুর শরীর দেব- দর্শনের সমতুল"[৯]।

নুনের এই পলাতক স্বভাব যেন লবঙ্গের মতো। ফাল্গুন মাসের শেষের দিকে বৃষ্টিকেই ভয় লবঙ্গের। বৃষ্টি জলে নুন থাকে না পানসে হয়ে যায়, নুনের এই পালিয়ে যাওয়ার ধর্মকে মেনে নিতে পারেনি লবঙ্গ। অনিল ঘোড়াই নুনের এই কুলটা স্বভাবের মধ্যে লবঙ্গের মনের সাদৃশ্য দেখিয়ে নারী মনের গভীরের চিত্র তুলে ধরেছেন- "তার এই পালিয়ে আসার সঙ্গে মাটি ছেড়ে নুন পালিয়ে যাবার কতটুকু মিল-অমিল সেই গূঢ় ভাবনায় মেতে ওঠে তার মন। শ্বশুরবাড়ি লোকের অত্যাচারে সে অতিষ্ঠ, তিতিবিরক্ত। মন বলে যে তার একটা সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষেত্র আছে তা কালাচাঁদ মানতে চায় না। কেবল ফি রাতে দ্রুত সহবাস। এই ছেলে ছাড়া স্বামীর কাছ থেকে সে আর কিছু পায়নি। উল্টে, কালাচাঁদ তাকে তেলগিলার শেষ তলানির মতো নিংড়ে নিয়েছে। প্রদীপের শেষ কানিটুকুর মতো পুড়িয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিতে চেয়েছে"[১০]। নারীর এই কদরহীন রূপ সমাজের সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। লিঙ্গ রাজনীতির শিকার এই উপন্যাসে লবঙ্গ।

গ্রামের বয়স্ক ব্যাক্তিরা জটায়ুকে পরামর্শ দেয় কীভাবে মেয়েকে বেঁধে রাখতে হয়। কিন্তু বেঁধে রাখা যে শক্ত সেটা গ্রামবৃদ্ধদের কথায় ব্যক্ত হয়েছে– "...দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে হে। আজকালকার মেয়েদের তালাচাবি দিয়ে সিন্ধুকে ভরে রাখলেও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। ওদের ঢলাঢলি বাতাসেও টের পায় না। শেষে পেট বাঁধিয়ে ফলিডল খেলে বোঝা যায়। তা বাপু নুন দিয়ে শুরু, শেষে শরীর দিয়ে শেষ না হয়"[১১]।

অবশ্য আধুনিক নারীর যৌনকামনার অসহায়ত্বের কথাও ব্যক্ত হয়েছে লেখকের কলমে। লবঙ্গের মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করেছেন লেখক- "...বারবার তখন তার কালাচাঁদের কথাই মনে পড়ছিল। শীতার্ত বাতাসে কেঁপে উঠেছিল তার দামাল ঋতুমতী বুক। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে তার খুব কষ্ট হয়। শীতাতুর বাতাসে শরীরের বাঁধা ঘাটে ছড়িয়ে যায় সে কাঁপুনি। এ কাঁপুনি বিপরীত উষ্ণতা ছাড়া জুড়ায় না। কালাচাঁদ তাকে মারত, মেরে কালসিটে ফেলে দিত, তবু ফি রাতে তাকে জড়িয়ে না ধরলে ঘুম হত না বেচারির। সেই ছোঁয়াচ নেশাটা লবঙ্গের শরীরে সংক্রামিত। তিনমাসের বিচ্ছেদে তার তীব্রতা আরো বেড়েছে। আসলে শরীরী নেশা, গোপন খেলার নেশা মানুষ কোনদিন চটকরে ভোলে না"[১২]। এই অবস্থা তার জীবনে বারবার ঘুরে আসে "নোনা হাওয়ায় তার চব্বিশ বছরের দেহলতাটা আগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে পুইডগার মতো নির্দিষ্ট মাচায় লতানোর জন্য ছটপট করে, এদিক সেদিক ঝোঁকে"[১৩]। আসলে মাংসাশীকে শাকাহারি করা ও প্রাকৃতিক যৌবনকে দমিয়ে রাখা যে কত কঠিন তা লবঙ্গ অন্তর দিয়ে বোঝে। লবঙ্গর বাল্যসখী অবলার কথায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মনঃস্তত্ত্ব ধরা পড়ে- "...ছাতা বিহীন মানুষের বড় দুর্ভোগ গো! বিনা ছাতায় রোদ ঝড় বৃষ্টি সে সামলাবে কী করে? ছাতা থাকলে সব

বাবা বাছাই টাইট। কেউ তার ধারে কাছে ঘেঁসতে সাহস পারেনি। তা তোমার একটা ছাতার দরকার লবং"[১৪]। পুরুষহীন নারী সমাজে যে অসহায় একথা অবলার রক্ষণশীল মানসিকতায় ধরা পড়ে। আখ্যানের শেষেও লেখক তাই বোধ হয় লবঙ্গকে একটা ছাতার সাথে জুড়ে দেন কণ্ঠিরামকে নিয়ে এসে। কণ্ঠিরাম এই নোনা বাতাসেও কোরা ধুতির মতো সাফা রেখেছে মনটাকে। এই কণ্ঠিরামকে সঙ্গে নিয়েই লবঙ্গ গড়ে তোলে নুনবাড়ি গড়ার স্বপ্ন। লবঙ্গের অনেক সময় মনে হয়েছে "পুরুষ মানুষের জোরই মেয়ে মানুষের জোর"[১৫]। গবেষক গোবিন্দ রায় তাঁর 'অনিল ঘড়াইয়ের 'নুনবাড়ি' : এক নিম্নবর্গীয় নারীর জীবন সংগ্রাম" প্রবন্ধে নুনবাড়ির শুরুতে ধ্বংস ও শেষে সৃষ্টির লক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন– "শুরুতে সর্বনাশের ইঙ্গিত, ভাঙা ঘরের ছবি, চোখের লহুতে নারীর অব্যক্ত যন্ত্রণা। শেষে নতুন দিনের আলো, নতুন প্রজন্মের হাত ধরে আগামীর দিকে দৃষ্টিবন্ধ করে বেঁচে ওঠার স্বপ্নময় ছবি"[১৬]।

স্বামী পরিত্যক্তা নারীর কাছে অসৎ সঙ্গে যাওয়ার অনেক প্রলোভন ছিল। এই প্রলোভনকে জয় করে লবঙ্গর স্বাধীন ভাবে পুরুষ নির্বাচনও আধুনিকতার লক্ষণ। আখ্যানে গ্রামপ্রধানের কুনজর ও কুপ্রস্তাব এড়িয়ে লবঙ্গ নিজেকে কৌশলে রক্ষা করেছে। কিন্তু কণ্ঠিরামের সরাসরি প্রেম প্রস্তাব ও লবঙ্গের প্রথম পক্ষের সন্তান নোনাইয়ের প্রতি ভালোবাসাই তাকে কণ্ঠিরামের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। আধুনিকা লবঙ্গ তাই বিয়ে না করেও কণ্ঠিরামকে শরীর সঁপেছে– "গলগলিয়ে তৃপ্ত ঘামের ধারা নেমে আসে সমস্ত শরীরে। কণ্ঠিরামের চোখে তখন লবঙ্গের বাঁধনহীন শরীরের দোলানি। ফিসফিসিয়ে বলে, তুই থাম লবং, অমন করে দোলা দিস না। তোর এত ঢেউ আমি ভাঙব কী করে, আমি যে সাঁতার জানিনে। কণ্ঠিরামের দুহাত লবঙ্গের সমস্ত দেহের উপর খেলা করে। লবঙ্গ বলে নুনবাড়িতে আবার ঢেউ আছে নাকি, নুনবাড়ি তো সুখের বাড়ি!"[১৭]

লবঙ্গের শরীর ও মনের সুখ কণ্ঠিরাম নিয়ে এলেও সুখ তো বেশিদিন সহ্য হয় না লবঙ্গর। দ্বিতীয় পক্ষের বউয়ের কাছে নিঃসন্তান স্বামী কালাচাঁদ নোনাইকে কৌশলে ছিনিয়ে নিয়ে যায় লবঙ্গের কাছ থেকে। এই নুনবাড়ি নিয়ে লোকজ সংস্কারবোধও তীব্র। নুনবাড়ি চলাকালীন নারী রজঃস্বলা হলে নুনবাড়ি কিছুদিন বন্ধ রাখতে হয়। লবঙ্গের বাল্যসখী অবলা এই ট্যাবুর পরিচয় করিয়ে দেয় লবঙ্গকে– "পেছন থেবড়ে বসবে তার জো নেই। তাহলে নুনমাটির রসালো আঠায় গোল হয়ে ভিজে যাবে মাটি। যা দেখে লোকে সন্দেহের চোখে তাকাবে। মেয়ে হয়ে জন্মানো যেন শতেক জ্বালার! মাসের ওই কটা দিন"[১৮]। কেউ যদি ওই সময় নুনবাড়ি ছোঁয় তাহলে নুন নাকি দানা হয় না, পানসে হয়ে নুনের স্বাদ উবে যায়। যদিও লবঙ্গ অবলার কথা পুরোপুরি মানে না। তাই এই পুরোপুরি না মানাটাই আধুনিকতার লক্ষণ। যেখানে সব সংস্কার ও ট্যাবুর বিচার হয়। আবার এক জায়গায় যেখানে লবঙ্গকে কুকুরে কামড় দেওয়ার পর, লবঙ্গ তার ও কণ্ঠিরামের অবৈধ মেলামেশায় সন্তান সম্ভাবনার কথা ভেবেছে। এই লোকজ বিশ্বাস লবঙ্গের মধ্যেও লালিত হয়েছে, লেখক বলেছেন– "অমাবস্যায় কুকুর কামড়ালে পেটে নাকি ছা হয়, আর সেই ছা পূর্ণিমা রাতে ঘেউ ঘেউ করে ডাকে। ঘরে ফিরে লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়েছে লবঙ্গ। আগুনের ছোঁয়ায় বিষ নাকি জল হয়ে যায়"[১৯]। যদিও পরে সে

ISBN : 978-93-6008-989-4

কণ্ঠিরামের আগ্রহেই ডাক্তার দেখায়। কিন্তু এই আধুনিকা নারীর পুরাতন লোকবিশ্বাসকে এভাবে লালন তাকে পুরাতনপন্থী বলে ভ্রম হয়।

নুনমাটি নিয়ে গ্রাম্য দলাদলি তৈরি হওয়ার অবস্থা তৈরি হয়। এই সময় গ্রামবৃদ্ধ জটাবুড়ো বেগতিক দেখে ফেলনার কোমর ধরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল, ফলে অষ্টাদশী ফেলনা জটাবুড়োর বিরুদ্ধে সম্মান হরণের অভিযোগ আনে। লবঙ্গ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেছিল- "...মেয়েমানুষের ধরম অত চট করে যায়নি বুন। ধরম তো নোনাখালের চট ওঠা পলি নয় যে, পায়ের চাপে ঝুরঝুরো হবে। তুই কি খেলনা! বাপের বয়সি মানুষটার মনে দুঃখ দেওয়া তোর ঠিক হয়নি"[২০]। অনুশোচনায় এরপর কেঁদে ফেলে ফেলনা। সব পুরুষই খারাপ নারীবাদের এই উগ্রতা হার মানে লবঙ্গের কথায়। এই লবঙ্গকে যখন তার বাবা জটায়ু লোকলজ্জার ভয়ে খালের কিনারে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়ে নিজেই বিপদে পড়েছিল তখন লবঙ্গ তার শরীর থেকে লজ্জাবস্ত্র খুলে প্রাণ বাঁচিয়েছিল জটায়ুর। লেখকের কথায়–"যে বস্ত্রখণ্ড মেয়েদের, তাবৎ পৃথিবীর মায়েদের লজ্জা ঢাকে সেই আটপৌরে মলিন শাড়িটা ধরে কোনমতে হাত-পা এলিয়ে ভাসতে ভাসতে চরের উপরে উঠে আসে জটায়ু। প্রাণ ফিরে পাওয়ার উন্মাদনায় মেয়ের দিকে তাকাতে গিয়ে লজ্জার বিদ্যুৎস্পর্শে হেঁট হয়ে যায় তার মাথা। লবঙ্গ তখন একহাতে বুক আর অন্যহাতে নিম্নাঙ্গ ঢেকে ঠকঠক করে কাঁপছে। অনাবৃত শরীর আর ভেজাচুল থেকে টপটপিয়ে জলের ধারা নামছে, আর সেই ধারার সাথে চোখের ধারা মিশে গভীর আত্মপ্রত্যয়ে ভরে উঠেছে তার বুক। উন্মত্ত বাতাসের মাঝে দাঁড়িয়ে তার মনে হয় সে হারেনি, হারতে পারে না"[২১]। এভাবেই প্রতিকূলতা ও মৃত্যুভয়কে দূরে সরিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মবিশ্বাসী লবঙ্গ জয়যুক্ত হয়েছে। এখানেই লবঙ্গ যেন মেয়ে (আভিধানিক অর্থ লতার মতো বেষ্টনকারী) থেকে যথার্থ নারী (আভিধানিক অর্থ পুষ্টিদানকারী) হয়ে উঠেছে।

স্বামী পরিত্যক্ত লবঙ্গের পেটের সন্তান নোনাই যখন সতীন মায়ের কাছেই চিরতরে থেকে যাবে বলে; তখন সহায়হীন নারী কণ্ঠিরামকেই প্রবল ভাবে আঁকড়ে ধরেছিল। কিন্তু তার পেটে যে কণ্ঠিরামের সন্তান লালিত হচ্ছে সমাজের চোখে এ পাপকে সে রাখবে কীভাবে। অবশেষে কণ্ঠিরামই তাকে অভয় দেয়- "বিপদ নিয়েই তো সংসার। তারে আমরা সামলাব"[২২]। তারা ভাবে তাদের মনে কোন পাপ নেই; পাপ যদি থাকে সে সমাজের কু-মনের। তাই- "...এই বেঁচে থাকাটা সমাজের চোখে অচ্ছুত হলেও তার কাছে খারাপ বলে মনে হয় না। নোনাখালের যে সমাজ তার প্রতি তার অশ্রদ্ধা নেই, ভালবাসাও নেই। তার সমাজ এবং বেঁচে থাকা কণ্ঠিরামকে আবর্তিত করেই। ওই বটগাছটার মতো কণ্ঠিরাম তার শরীরে ঝুরি নামিয়েছে, শিকড় প্রোথিত করেছে রক্তে। নুনবাড়ির যুবতি মন লবণাক্ত হলে তাকে পরিস্রুত করার জন্য কারো না কারোর দৈহিক এবং মানসিক সাহচর্য প্রয়োজন। ... সে নোনাইয়ের মা, কালাচাঁদের স্ত্রী। তারা তাকে যে সামাজিক মর্যাদা দিয়েছে এখন সেই ঠুনকো মর্যাদার কোন মূল্য নেই তার কাছে। ...যে সমাজ একটা খোঁটা উপড়ানো মেয়েকে বিপদে রক্ষা করতে পারে না, সেই অবক্ষয়ী গলিত কুটিল ভ্রষ্ট সমাজকে সে মানে না। নারী যে এই হীন সমাজে অন্যের উপভোগের

ISBN : 978-93-6008-989-4

দ্রব্য নয়, নারীর যে স্বাধীন ভাবে চাওয়া পাওয়া থাকতে পারে এটা সে সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায়"[২৩]। এই স্বাধীনভাবে চাওয়া পাওয়ার মধ্যেই সে আধুনিক হয়ে উঠেছে। তাই তো নিতাই সাঁতরা, ছোকরা গ্রামপ্রধানকে সে শরীর সমর্পণ করেনি। যেখানে মন নেই সেখানে সায় দেয়নি এই নারী। সে সমাজের কাছে প্রশ্ন তোলে- "পুরুষের দ্বিতীয় নারী, তৃতীয় নারী এমনকী একাধিক নারী যখন কোন নিন্দার নয়, তখন মেয়ে হয়ে দ্বিতীয় স্পর্শ চাওয়াটা কি ভুল?"[২৪] নির্দয় সমাজ ভয়ে ভীত লবঙ্গ তাই পেটের সন্তান ও নিজেদের বাঁচাতে তারা শহরে চলে যেতে চেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বাঁচার সিদ্ধান্তকে খারিজ করে তারা ফিরে আসে নুনবাড়িতেই। আর তাই এই আখ্যানে নারী লিঙ্গ রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে প্রশ্ন করে সমাজকে- "এই প্রায় পুরুষ দলিত সমাজে পুরুষের পদস্খলন, স্বৈরাচার, অসংযম, স্বেচ্ছাচার, বিধ্বংসী জীবনযাপন যদি নির্বিবাদে সকলে মেনে নেয় তাহলে একটা অসহায় আত্মসমস্যা জর্জরিত মেয়ের বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে কেন?"[২৫]

তথ্যসূত্র

১) উদ্ধৃতি: অরূপ পলমল, 'সৃজন' অনিল ঘড়াই বিশেষ সংখ্যা, পৃ: ১১৬।
২) সুনীল মাজি। অনিল ঘড়াইয়ের সাক্ষাৎকার। সুস্নাত জানা ও সুনীল মাজি সম্পাদিত। প্রসঙ্গ অনিল ঘড়াই। দে'জ পাবলিকেশন। কলকাতা। ২০০৪। পৃ-৪৩৫।
৩) অনিল ঘোড়াই। নুনবাড়ি। পৃ-৪৮।
৪) তদেব। পৃ-১০-১১।
৫) তদেব। পৃ-১১।
৬) তদেব। পৃ-৩০।
৭) তদেব। পৃ-২৩।
৮) তদেব। পৃ-৩০।
৯) তদেব। পৃ-৪১।
১০) তদেব। পৃ-৬৯।
১১) তদেব। পৃ-৩১-৩২।
১২) তদেব। পৃ-২০।
১৩) তদেব। পৃ-২৭-২৮।
১৪) তদেব। পৃ-৫৬।
১৫) তদেব। পৃ-৮৩।

ISBN : 978-93-6008-989-4

১৬) গোবিন্দ রায়। "অনিল ঘড়াইয়ের 'নুনবাড়ি' : এক নিম্নবর্গীয় নারীর জীবন সংগ্রাম"। ত্রিসঙ্গম ইন্টারন্যাশনাল রেফার্ড জার্নাল। Vol-3। Issue-2। April 20। article-25।

১৭) অনিল ঘোড়াই। নুনবাড়ি। পৃ-৭৪।

১৮) তদেব। পৃ-৫২।

১৯) তদেব। পৃ-১০৫।

২০) তদেব। পৃ-৬৩।

২১) তদেব। পৃ-৩৮।

২২) তদেব। পৃ-১১৯।

২৩) তদেব, পৃ-১২০, ১২১।

২৪) তদেব। পৃ-১২৭।

২৫) তদেব। পৃ-১২৮।